

গ্রামীণ ক্ষমতার পালাবদল মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

গ্রাম্য রাজনীতি বা ভিলেজ পলিটিক্স শব্দটির সাথে কম বেশি আমরা পরিচিত। এটি কখনো কখনো নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং পারতপক্ষে অনেকেই এই পলিটিক্স থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেন। গ্রামে থাকবেন অথচ পলিটিক্সে জড়াবেন না এটা ৫০ বছর আগে হয়ত সম্ভব ছিল, কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে আপনাকে বা আপনার পরিবারকে গ্রামীণ ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হচ্ছে। নামের সাথে পলিটিক্স যুক্ত থাকলেও বাস্তবে এটা এমন এক রহস্যময় রাজনীতি যার কুলকিনারা করা সত্যি দুষ্কর। যুগের পরিক্রমায় এ ভিলেজ পলিটিক্সেও পরিবর্তন এসেছে, তবে নতুন আঙ্গিকে আর কৌশলে।

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর এই বিবর্তনের শুরুরটা কেমন ছিল সে গল্প বলতে যেতে হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনকালে। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় দু’শ বছর ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশ। ১৯৪৭ সালের পর ভারত-পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। অর্থাৎ ৩টি দেশেই স্থানীয় সরকার তথা গ্রামের প্রশাসনিক কাঠামোর যে বৈশিষ্ট্য তা ব্রিটিশ শাসনের উত্তরাধিকার। ব্রিটিশ শাসনের মূল লক্ষ্যই ছিল তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে স্থানীয় শাসন কাঠামো গড়ে তোলা। এজন্য তারা পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রবর্তন করেছে নানা প্রশাসনিক নিয়ম নীতি। ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত এই উপমহাদেশে গ্রামীণ পঞ্চায়েত ছিল গ্রামীণ প্রশাসনিক কাঠামোর মূল কেন্দ্রবিন্দু। ব্রিটিশ শাসকগণ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে নিজেদের আয়ত্বে আনার জন্য ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় জমিদারি ব্যবস্থা প্রথা প্রবর্তন করে। যার মধ্য দিয়ে খাজনা আদায়ে এদেশের জমিদার শ্রেণিকে ব্যবহার করতে থাকে। মোঘল আমলে যেভাবে পঞ্চায়েতে একে অপরকে সহযোগিতা করতো ব্রিটিশ আমলে পঞ্চায়েতের পরিবর্তে জমিদারি প্রজা দমনে শুধু গ্রামে নয় পুরো সমাজ ব্যবস্থায় শাসকদের সমর্থনে এক অত্যাচারী শ্রেণি হিসেবে গড়ে উঠে।

জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পর মানুষকে আধুনিক ছলাকলায় শোষণ করার জন্য গ্রামীণ সমাজে সৃষ্টি হয়েছে ধূর্ত, চাটুকার ও দূরভিসন্ধি সম্পন্ন মাতবর শ্রেণি। গ্রামীণ সমাজ নিয়ন্ত্রণ করা এসব মানুষের আসল চরিত্র এমন যে, ভালো মানুষেরা গ্রামীণ রাজনীতির মাতবরদের ঘূর্ণিপাকে পড়ে অনেক সময় টিকে থাকতে পারে না। মাতবর ও চাটুকারদের কর্মকাণ্ড মানুষ নামের মানবিকতাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। তারপরও একজন খারাপ মানুষ সমাজের দশজন ভালো মানুষের চাইতে হয়ত শক্তিশালী, কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। পাকিস্তান আমলে ব্রিটিশ আইনগুলোর অনুসরণে পরবর্তী দশ বছর স্থানীয় শাসন অব্যাহত থাকে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারীর পর ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে ৪(চার) স্তরের স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোর নির্দেশনা জারি করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্রে সর্বশেষ স্তর ইউনিয়ন পরিষদ মুসলিম লীগের সমর্থক ও অনুসারীদেরকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মেম্বর এবং মোট তেরজন (নির্বাচিত ৯ জন ও মনোনীত ৪জন) মেম্বরের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। এই পদ্ধতিকে বেসিক ডেমোক্রেসি বা মৌলিক গণতন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। যার বেশি টাকা ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তঁরাই নির্বাচিত হতেন। এখানে দলীয় আনুগত্য আর প্রভাবই ছিল নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা। এভাবে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে সুকৌশলে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে কেন্দ্রীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নকল্পে সব সরকারই প্রণয়ন করেছে আইন আর বিধিমালা। পক্ষে-বিপক্ষে রয়েছে অনেক আলোচনা সমালোচনা। স্বাধীনতার পর নতুন প্রেক্ষাপটে দেশের স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোয় আসে আমূল পরিবর্তন। মুসলিম লীগের পরিবর্তে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীগণের প্রভাব তখন তুঙ্গে। গ্রাম পর্যন্ত এই প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে। অভাবী মানুষের জন্য দেয়া রিলিফ আর ত্রাণ বিতরণের দায়িত্বে অবহেলা আর দুর্নীতির অভিযোগ তুলে হাশিয়ারি উচ্চারণ করেন স্বয়ং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ ধারার পরিবর্তন হতে থাকে ১৯৭৫ সালের পর থেকে। গ্রামীণ ক্ষমতা ভূমির মালিকানা, বংশীয় মর্যাদা, পারিবারিক ঐতিহ্য প্রভৃতি আবার ক্ষমতা নির্ধারণের মানদণ্ড হয়ে উঠে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হতে থাকায় গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা বড় কৃষক আর ধনীদেব উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোয় রাজনৈতিক দলের প্রভাব উগ্রভাবে গ্রামে গঞ্জে দেখা যায়নি।

তবে ১৯৮০ সালে একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ‘গ্রাম সরকার’ পদ্ধতি গঠন করা হয়। এটির গঠন প্রক্রিয়াটি এতটাই অগণতান্ত্রিক ছিল যে গ্রামে গ্রামে দলাদলি আর বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। কারণ এর গঠন পদ্ধতি ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। একজন থানা পর্যায়ের কর্মকর্তার উপস্থিতিতে গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক জনগণ একত্রিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে গ্রাম সরকার গঠন করার নীতি থাকলেও প্রভাবশালীরা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বশীভূত বা প্রভাবিত করে ইচ্ছেমতো সরকার গঠন করতে থাকে। এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বি গুপের সাথে সংঘাত বাড়তে থাকে। কিন্তু ২০০৭ সালে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এসে বা গ্রাম সরকার পদ্ধতি বাতিল করে। এভাবে ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের উন্নয়ন কাজে কখনো মুক্ত থেকেছে আবার কখনো বাঁধা পড়ে গেছে ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতার কাছে। এ ভাবে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে প্রায় সকল কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামে একটি অনুগত শ্রেণি গড়ে তুলতে চেয়েছে। এরই অপভ্রংশ হিসেবে শেকড় গেড়েছে ভিলেজ পলিটিক্স, যা কোথাও পরিণত হয়েছিলো সামাজিক অনাচারে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই গ্রামের রাজনীতি, সামাজিক সম্পর্কে এসেছে নতুন সমীকরণ। এই পরিবর্তনের ধারায় আবারো সূচিত হয় নতুন মাত্রা, যা নতুন করে পুরো সমাজকে চিন্তার সুযোগ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে স্থানীয় ও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় আবারও কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রভাব বিস্তার। ২০১৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় রাজনৈতিক দলের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভূমিকা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। কে ইউনিয়ন পরিষদে মেম্বর বা চেয়ারম্যান হবেন তা নির্ধারণ করে দেয় রাজনৈতিক দল।

গ্রামে বা ইউনিয়নে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন তা নির্ধারণের শর্ত তাকে প্রথমে দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়া। গ্রামের বা এলাকার মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু সে বিবেচনা প্রাধান্য পায় না।

এ কথা ঠিক যে গ্রাম নিয়ে এখন জোতদার-মাতবরদের চেয়েও বেশি ভাবছে সরকার। আর তাইতো শহরকে গ্রামে নেওয়ার জন্য গ্রামের রাজনীতিতে পরিবর্তনের বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বর্তমান সরকার এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ নামকরনে একটি পাইলট প্রকল্প শুরু করে। ২০২৩ সালেটতা পূরনাংগ প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়নাধীন আছে। আর এভাবে ভিলেজ পলিটিক্সের চিরায়ত রূপ পাল্টাতে থাকে, সামাজিক বিন্যাস এবং গ্রাম উন্নয়নে আসে নতুন সমীকরণ।

আশার কথা, বর্তমান সরকার আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে দলীয় প্রার্থীর বাইরে একজন উপযুক্ত নেতা নির্বাচনের সুযোগ হওয়ায় গ্রামের মানুষ দলীয় প্রভাবের বাইরে নিজেদের পছন্দের কোন প্রার্থীকে উপজেলা এবং পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচনে সমর্থ হবেন বলে আশা করা যায়। যা গ্রামীন ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসে আনবে নতুন মাত্রা।

#

লেখকঃ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক

পিআইডি ফিচার